পাখিবান্ধব নগর ও সমাজ গড়ার আহ্বান

দীপংকর বর

দূর দিগন্তের ডাকে সাড়া দিয়ে প্রতিবছর কোটি কোটি পরিযায়ী পাখি তাদের প্রজনন ক্ষেত্র অথবা শীতকালীন আশ্রয়ের সন্ধানে হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয়। এই অসাধারণ যাত্রা শুধুই প্রাকৃতিক প্রেরণায় নয় বরং টিকে থাকার এক নিরন্তর সংগ্রাম। উপযুক্ত আবহাওয়া, খাদ্য এবং বাসস্থানের খোঁজে তারা ছুটে চলে মহাদেশ থেকে মহাদেশে। এই পরিযাণ এক জটিল এবং বিস্ময়কর প্রক্রিয়া। দিক নির্ণয়, শারীরিক সক্ষমতা এবং অনুকূল পরিবেশ -এই বিষয়গুলি পরিযায়ী পাখিদের সফল যাত্রার জন্য অপরিহার্য। জলাভূমি, বনভূমি, তৃণভূমি এবং উপকূলীয় অঞ্চল-এইসব প্রাকৃতিক আবাসস্থল পরিযায়ী পাখিদের বিশ্রাম, খাদ্য সংগ্রহ এবং সাময়িক আশ্রয় দেওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানুষের অসচেতনতা এবং পরিবেশের দ্রুত পরিবর্তনের কারণে এই মূল্যবান আবাসস্থলগুলো আজ হুমকির মুখে।

পরিযায়ী পাখিদের বিস্ময়কর এ যাত্রা ও তার গুরুত্বকে কেন্দ্র করেই প্রতিবছর মে মাসের দ্বিতীয় শনিবার পালিত হয় বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস। ২০২৫ সালের ১০ মে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই দিনটি। এবারের প্রতিপাদ্য- 'শেয়ার্ড স্পেসেস: ক্রিয়েটিং বার্ড-ফ্রেন্ডলি সিটিজ অ্যান্ড কমিউনিটিজ' অর্থাৎ 'অংশীদারিত্বের স্থান: পাখিবান্ধব নগর ও সমাজ গঠন'- পাখির সঙ্গে মানুষের সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য এক তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা নিয়ে এসেছে।

পরিযায়ী পাখিরা কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে না, তারা বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করে ফসল রক্ষা করে, ফুলের পরাগায়নে সাহায্য করে এবং বীজের বিস্তারে ভূমিকা রাখে। পরিযায়ী পাখিদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া পরিবেশের জন্য একটি অশনি সংকেত। এটি জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি এবং খাদ্যশৃঙ্খলের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

আজকের শহর শুধু মানুষের বসবাসের স্থান নয়; এটি এখন জীববৈচিত্র্যের একটি জটিল ক্ষেত্র, যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির সহাবস্থান জরুরি হয়ে পড়েছে। পরিযায়ী পাখিদের জন্য শহর সাময়িক আশ্রয়, খাদ্যের উৎস ও বিশ্রামের জায়গা হতে পারে। কিন্তু বাস্তব চিত্র ভিন্ন। অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে আমরা প্রকৃতি থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হচ্ছি, সবুজ জায়গা হারাচ্ছে, জলাশয় ভরাট ও দূষিত হচ্ছে, আর নির্বিচারে গাছ কাটায় পাখির নিরাপদ আশ্রয় কমে যাচ্ছে। তীব্র আলো ও শব্দের দূষণ পাখিদের স্বাভাবিক আচরণ ব্যাহত করছে, রাতের আলো তাদের পথ ভুল করায়, আর উচ্চশব্দ বংশবৃদ্ধি ও যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটায়, এমনকি খাদ্যচক্রে ব্যাঘাত ও মৃত্যুও ডেকে আনে। কীটনাশক ও রাসায়নিক সার পাখিদের খাদ্য বিষাক্ত করে তোলে, ফলে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে বা মারা যায়। বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা খেয়ে বা যানবাহনের নিচে চাপা পড়ে বহু পাখি মারা যায়। অথচ শহরেই গাছ, পার্ক, লেকপাড় ও বাড়ির ছাদে পরিযায়ী পাখিরা আশ্রয় নেয়। তাই শহর যদি পাখিবান্ধব হয়, তা শুধু পাখিদের নয়, মানুষ ও প্রকৃতির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথও তৈরি করবে।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মতো শহরগুলোতেও প্রতিবছর পরিযায়ী পাখি আসে। বিশেষ করে শীত মৌসুমে দেখা মেলে নানা প্রজাতির হাঁস, চিল, বক, গাংচিল, গুটিবকসহ নানা প্রজাতির পাখির। ঢাকার মতো ব্যস্ত শহরেও দৃষ্টিনন্দন কিছু পরিযায়ী পাখির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় গুলশান লেক, হাতিরঝিল, রমনা উদ্যান কিংবা সংসদ ভবনের আশপাশে। এইসব পাখি শহরবাসীর কাছে আনন্দের উৎস হলেও বাস্তবতার নিরিখে তারা প্রতিবছর অনিরাপদ হয়ে পড়ে। অনেক সময় শহরের শিশুরা কিংবা শিকারিরা কৌতূহলবশত পাখিকে ধরতে চায়, আবার কোথাও কোথাও পাখির ডিম ও বাসা নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি অবৈধ পাখি বাজারেও এসব পরিযায়ী পাখিকে বন্দি অবস্থায় পাওয়া যায়।

এই প্রেক্ষাপটে এবারের প্রতিপাদ্য আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় - আমাদের শহর যেন কেবল মানুষের জন্য নয়, পাখির জন্যও যেন হয় বাসযোগ্য। এর অর্থ হচ্ছে, শহর উন্নয়নের প্রতিটি ধাপে আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে পাখি ও অন্যান্য জীববৈচিত্র্যকে। শহরের পরিকল্পনায় 'সবুজ বেল্ট' রাখার কথা বারবার বলা হলেও বাস্তবে দেখা যায় বৃক্ষনিধনের হার দ্রুত বাড়ছে। জলাশয় সংরক্ষণের উদ্যোগ থাকলেও তা প্রায়শই যথাযথভাবে কার্যকর হয় না। অথচ কয়েকটি সহজ পদক্ষেপের মাধ্যমেই শহরকে পাখিবান্ধব করে তোলা সম্ভব।

একটি পাখিবান্ধব নগর গড়ে তুলতে হলে পরিকল্পিতভাবে পরিবেশবিদ স্থপতি, নগর পরিকল্পনাবিদ, নীতিনির্ধারক ও সাধারণ মানুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণ দরকার। নতুন ভবন তৈরির সময় কাচের ব্যবহার সীমিত রাখা বা পাখিবান্ধব আবরণ ব্যবহার করা যেতে পারে যাতে পাখি ধাক্কা খেয়ে মারা না যায়। নগর এলাকায় পাখির জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে স্থানীয় প্রজাতির গাছ লাগানো জরুরি, যেগুলো তাদের খাদ্য জোগায় এবং বাসা বানানোর জায়গা দেয়। বিদ্যুতের তার মাটির নিচে নেওয়া, জানালায় প্রতিফলক লাগানো কিংবা উন্মুক্ত কাচে স্টিকার বসানো এ ধরনের ছোটো ছোটো উদ্যোগ অনেক পাখির প্রাণ বাঁচাতে পারে। শহরের শিশু-কিশোরদের পাখির প্রতি ভালোবাসা ও সচেতনতা গড়ে তুলতে স্কুলভিত্তিক বার্ড ওয়াচিং কার্যক্রম চালু করা যেতে পারে ভবিষ্যতের নাগরিকদের পরিবেশবান্ধব ও সংবেদনশীল করে তুলবে। শহরের জলাশয়গুলো রক্ষা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। পাশাপাশি, আলোক দূষণ রোধে রাতে অপ্রয়োজনীয় আলো নিভিয়ে রাখা এবং শব্দ দূষণ কমাতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

পাখিবান্ধব নগর মানে কেবল পাখির জন্য নয়, বরং সব জীবের জন্য সহনশীল ও টেকসই এক নগর। এমন নগরে বৃক্ষ থাকবে থাকবে খোলা মাঠ, জলাশয়, আর নিঃশব্দ বিশ্রামের স্থান। এমন পরিবেশে শুধু পাখি নয়, মানুষও পায় মানসিক শান্তি, পরিবেশ পায় ভারসাম্য। আমরা যখন শহরকে পাখির জন্য বাসযোগ্য করে তুলি, তখন পরোক্ষভাবে আমরা নিজেদের জীবনযাত্রাকেও উন্নত করি। বায়ুদূষণ কমে, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং শহরের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পায়।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তর পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। পরিযায়ী পাখি শিকার ও পাচার বন্ধে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। পাখি শিকার ও বিক্রির বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালিত হয়। হাওর বিলে থাকা জলাভূমি, চন্দ্রনাথ পাহাড়, টেকনাফ বিচ, হাকালুকি ও টাঙ্গুয়ার হাওরসহ গুরুত্বপূর্ণ পাখির বিচরণভূমিকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত ও ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হয়েছে। স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে কমিউনিটি প্যাট্রল দল গঠন করা হয়েছে, যারা পাখি শিকার রোধে কাজ করে। এ ছাড়া বিকল্প আয়ের সুযোগ তৈরি করে পাখি শিকার থেকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। পরিযায়ী পাখি পর্যবেক্ষণ করে উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে সংরক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করবে। বন অধিদপ্তর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও কনভেনশনের সঙ্গে কাজ করছে যাতে পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক উদ্যোগের সঙ্গে সমন্বয় করা যায়। পরিবেশ অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর ও বিভিন্ন সিভিল সোসাইটি সংগঠন পাখির আবাসস্থল সংরক্ষণের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির জন্য কর্মশালা, পোস্টার, লিফলেট ও গণমাধ্যমে প্রচার চালানো হচ্ছে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও আমরা ছোটো ছোটো পরিবর্তন আনতে পারি যা পরিযায়ী পাখিদের জন্য বিশাল পার্থক্য তৈরি করতে পারে। আমাদের বাড়ির আশেপাশে এবং বারান্দায় পাখির জন্য পানির পাত্র রাখা শস্যদানা ছড়িয়ে দেওয়া তাদের কঠিন সময়ে সাহায্য করতে পারে। কীটনাশক ব্যবহার এড়িয়ে গিয়ে জৈব পদ্ধতিতে বাগান পরিচর্যা করলে পাখিদের খাদ্য নিরাপদ থাকবে। আহত পাখি দেখলে দ্রুত উদ্ধার করে পশুচিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া মানবিক দায়িত্ব। পরিযায়ী পাখি এবং তাদের আবাসস্থলের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করাও অত্যন্ত জরুরি। স্কুল, কলেজ এবং গণমাধ্যমে প্রচারণার মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পরিবেশ সচেতন এবং পাখিপ্রেমী হিসেবে গড়ে তুলতে পারি।

'অংশীদারিত্বের স্থান: পাখিবান্ধব নগর ও সমাজ গঠন'- এই প্রতিপাদ্যটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে মানুষ এবং প্রকৃতি একে অপরের পরিপূরক। আমরা যদি একটু সচেতন হই এবং দায়িত্বশীল আচরণ করি, তাহলে আমাদের শহর এবং জনপদগুলো পরিযায়ী পাখিদের জন্য নিরাপদ এবং বাসযোগ্য আশ্রয়স্থল হয়ে উঠতে পারে। আসুন, ২০২৫ সালের বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবসে আমরা সকলে মিলে প্রতিজ্ঞা করি যে আমরা আমাদের পৃথিবীকে সকল প্রাণের জন্য, বিশেষ করে এই দীর্ঘ পথযাত্রী পাখিদের জন্য আরও বাসযোগ্য করে তুলব। যেন নগরের প্রতিটি গাছ, প্রতিটি পুকুর, প্রতিটি ছাদ যেন পাখির ডানার ছায়ায় মুখরিত হয়। একটি সহাবস্থানভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতেই হবে- যেখানে মানুষ ও পাখি একসাথে শ্বাস নিতে পারে, বাঁচতে পারে। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পারবে প্রকৃতির অলংকার, সুরের ঝর্ণাধারা আর বাস্তুতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী, প্রকৃতির এই অমূল্য সম্পদকে রক্ষা করতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ ও সুন্দর পৃথিবী নিশ্চিত করতে।

#

লেখক: উপপ্রধান তথ্য অফিসার, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

পিআইডি ফিচার